আশুলিয়ায় সাম্প্রতিক শ্রমিক আন্দোলন: কারণ এবং মালিকপক্ষ

তাসলিমা আখ্‌তার

গত ১১ ডিসেম্বর থেকে আশুলিয়ায় শ্রমিকদের বিক্ষোভ রাস্তায় আসে। সারা দেশের পোশাক কারখানার এক তৃতীয়াংশই আশুলিয়ায় অবস্থিত। পুলিশ বিজিবিসহ বিভিন্ন বাহিনীর নির্যাতন, গ্রেপ্তার, হুমকি সত্ত্বেও দুসপ্তাহ ধরে আন্দোলন অব্যাহত থাকে। কেন এই আন্দোলন? বর্তমান প্রবন্ধে এই আন্দোলনের প্রেক্ষাপট, মালিকদের স্বার্থে রাষ্ট্রীয় বাহিনী ও ভাড়াটে সন্ত্রাসীদের হামলা মামলা এবং আন্দোলনের শক্তি- দুর্বলতা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

আশুলিয়ার শ্রমিক অঞ্চলে এখনও থমথমে পরিবেশ। শ্রমিকরা ভোর হতেই কাজে যায় ঠিকই, কিন্তু প্রাণচঞ্চল কর্মমুখর পরিবেশ নেই। প্রতি ভোরে তরুণ শ্রমিকরা যখন দল বেঁধে কাজে যায় সাধারণত তাদের মধ্যে হুড়োহুড়ি-উচ্ছলতা থাকে, কিন্তু তেমনটা নেই আজকাল। একরাশ পায়ের মার্চপাস্টে এখন সবাই কেমন যেন আঁটোসাঁটো। কারখানার ভেতরেও শ্রমিকরা নিজেদের মধ্যে আন্দোলন নিয়ে তেমন কথাবার্তা বলে না। শ্রমিকরা টয়লেটে গেলেও প্রশাসনের হর্তাকর্তারা খেয়াল রাখে একজন আরেকজনের সাথে পথে কিছু বলছে কি না। রাতে কাজ থেকে ফিরে মহলার ভেতর আড্ডা বা চায়ের দোকানে বসা, পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ-আলোচনা–সব কিছুতেই কেমন একটা সতর্কতার ছাপ। এমনকি চায়ের দোকানি পর্যন্ত ভীত। পুলিশি হুমকি থেকে রেহাই জোটেনি স্থানীয় দোকানি, বাড়িওয়ালা কিংবা আশপাশে থাকা পরিবারের আত্মীয়স্বজনদের। ফলে ভীতি কাটেনি তাদেরও। এই ধরনের শ্রমিক বা শ্রমিক নের্তৃত্বকে বাসা ভাড়া দেয়ার অপরাধে কখন পুলিশ ধরে নেয়–এইসব দুর্ভাবনায় আছে বাড়িওয়ালারাও। কারখানার দাবি এবং মজুরি ৫৩০০ থেকে ১৬০০০ টাকায় বৃদ্ধির দাবির অপরাধে মামলার আতঙ্ক তাড়া করে বেড়াচ্ছে ১৫০০ শ্রমিককে, যাদের কেউ কেউ আছে জেলে। বরখাস্ত ১৬০০ শ্রমিক তাদের কাজ ফিরে পায়নি। পুরনো কাজের জায়গা থেকে পাট চুকিয়ে এখন নতুন কাজের সন্ধানে যেতে বাধ্য হয়েছে।

একরাশ পায়ের মার্চপাস্টে এখন সবাই কেমন যেন আঁটোসাঁটো। কারখানার ভেতরেও শ্রমিকরা নিজেদের মধ্যে আন্দোলন নিয়ে তেমন কথাবার্তা বলে না। শ্রমিকরা টয়লেটে গেলেও প্রশাসনের হর্তাকর্তারা খেয়াল রাখে একজন আরেকজনের সাথে পথে কিছু বলছে কি না। রাতে কাজ থেকে ফিরে মহলার ভেতর আড্ডা বা চায়ের দোকানে বসা, পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ-আলোচনা–সব কিছুতেই কেমন একটা সতর্কতার ছাপ। এমনকি চায়ের দোকানি পর্যন্ত ভীত।

এলাকার সমস্ত শ্রমিক সংগঠনের প্রকাশ্য কার্যকলাপ বন্ধ। পুলিশের নির্দেশনায় বন্ধ আশুলিয়ার শ্রমিকপাড়ার সব শ্রমিক সংগঠনের অফিস। স্থানীয় শ্রমিক নেতৃত্বের বড় অংশ জেলে, আর যারা জেলের বাইরে তারা সব ঘরছাড়া, এলাকাছাড়া। প্রকৃত ইউনিয়ন বলে কারখানায় কোনো ইউনিয়ন নেই। উল্টো আছে ক্ষমতাসীন দল-মালিক-বিদেশি প্রভু-আস্থাভাজনদের কাগুজে ইউনিয়ন, নয়তো মালিকপক্ষের পছন্দে গড়া খুব অল্প কিছু পার্টিসিপেটরি কমিটি। এলাকায় আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি মাত্রায় তৎপর রয়েছে ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় নেতা-মাস্তান, মালিকদের পাহারাদার-ঝুট ব্যবসায়ীদের প্রতাপ। ঢাকা থেকে ৩০-৩৫ কিলোমিটার দূরে আশুলিয়ার শ্রমিকপাড়াগুলোর মধ্যে জামগড়া, ভাদাইল, নরসিংহপুর, নিশ্চিন্তপুর, ছয়তলা, বাইপাইল, ইউনিক, কাইচাবাড়ী, পলী বিদ্যুৎ, গাজীরচটসহ বিভিন্ন এলাকার অলিগলিতে, কারখানার গেটে–সর্বত্রই রয়েছে পুলিশ-ডিবির নিয়মিত আনাগোনা-টহল। বন্ধ হয়নি শ্রমিক ও নেতাদের খোঁজে বাড়িতে বাড়িতে সাদা পোশাকের পুলিশের আসা-যাওয়া। ভয় ছড়িয়েছে সর্বত্র। কথা বললেই সর্বনাশ। এই হচ্ছে বর্তমানে আশুলিয়ার শ্রমিকাঞ্চলে সরকার ও মালিকপক্ষ নিয়ন্ত্রিত 'শান্ত পরিবেশ'।

আশুলিয়ার শ্রমিক অসন্তোষ এবং ২০১৬-র ডিসেম্বরের প্রায় দুই সপ্তাহ জুড়ে থাকা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পোশাকশিল্পে শ্রমিকদের দুরবস্থা, কারখানাভিত্তিক দাবির প্রাসঙ্গিকতা ও মজুরি বৃদ্ধির প্রসঙ্গটিই পত্রপত্রিকার পাতায় খবর হয়ে আবারও সামনে এসেছে। আন্তর্জাতিক মিডিয়ায়ও আলাপ উঠেছে এ নিয়ে। আন্দোলন চলাকালে এবং তার পরবর্তী সময়ে এই দাবির যৌক্তিকতা নিয়ে শ্রমিক স্বার্থের পক্ষের শক্তিগুলো যেমন যুক্তি হাজির করেছে, তেমনি সরকার ও মালিকগোষ্ঠী তাদের ভিন্নমত হাজির করছে। প্রশ্ন এসেছে, এই দাবি কতটা ন্যায্য বা সংগত। দাবির যৌক্তিকতা এবং মালিকপক্ষের মত বিষয়ে বিস্তারিত বলার আগে এই আন্দোলনের প্রেক্ষাপট কিছুটা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।

প্রেক্ষাপট

২০১৬-র ডিসেম্বরের ১১ তারিখ থেকেই আশুলিয়ায় শুরু হয় কারখানাভিত্তিক আন্দোলন। এটি নতুন মাত্রা পায় মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে। সারা দেশে মোট ৪৩২৮টি পোশাক কারখানার মধ্যে প্রায় ১৫০০ কারখানা ঢাকার আশুলিয়ায় অবস্থিত। ফলে আশুলিয়া বরাবরই শ্রমিক, মালিক ও সরকারের জন্য একটি সংবেদনশীল জায়গা। এই অঞ্চলে একটি কারখানার আন্দোলনের খবর পাশের কারখানায় পৌছতে সময় লাগে না, সময় লাগে না পাশের কারখানায় আন্দোলনের বিস্তার ঘটতেও। এ অঞ্চলেই ১১ থেকে ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত নানা মাত্রায় আন্দোলন চলে। আন্দোলন ধাপে ধাপে নানা মাত্রা পায়।

প্রথমে জামগড়ার উইন্ডি গার্মেন্ট থেকে ১১ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে আন্দোলন শুরু হয়। এলাকার অন্যান্য কারখানার সাথে মিল রেখে বার্ষিক ইনক্রিমেন্টের পরিমাণ বৃদ্ধির দাবি ছিল এখানে। এর আগে ১৩ অক্টোবর ২০১৬ তাসলিমা নামের একজন উইন্ডি শ্রমিকের মৃত্যু বিষয়েও ছিল জমা ক্ষোভ। শ্রমিকদের মতে, অসুস্থ হওয়ার পরে নয়, বরং মারা যাওয়ার পর তাঁকে হাসপাতালে নেয়া হয়। তাসলিমার মৃত্যুর বিচার না পাওয়া, ইনক্রিমেন্ট এবং মজুরি বৃদ্ধির দাবিকে গুরুত্ব না দেয়ায় শ্রমিকরা ক্ষুব্ধ হলেও মালিকপক্ষ একচেটিয়াভাবে সমস্তটা নাকচ করে। উল্টো শ্রমিকদের চাকরিচ্যুতিসহ অন্যান্য হুমকি দেয়।

উইন্ডি ছাড়া অন্যান্য কারখানায় এই সময়ে ছিল কথায় কথায় ছাঁটাই, অকথ্য ভাষায় গালাগাল, বার্ষিক ছুটি ও টিফিন-নাইট বিল, প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা ঠিকমতো পরিশোধ না হওয়া এবং নির্যাতন-হয়রানি-বিরোধী স্বর।

কারখানাভিত্তিক দাবির পাশাপাশি প্রায় তিন বছর পর আশুলিয়ার শ্রমিকদের মধ্যে মজুরি ৫৩০০ টাকা থেকে ১৬০০০ টাকায় (১০০০০ টাকা বেসিক এবং সর্বমোট ১৬০০০ টাকা) বাড়ানোর দাবিও ওঠে। তিন বছর আগে ২০১৩ সালে পোশাক শ্রমিকরা মজুরির বেসিক ৮০০০ টাকাসহ সর্বমোট ১২০০০ টাকা করার দাবি তোলে। সে সময় মজুরি ছিল সর্বমোট ৩০০০ টাকা। কিন্তু ওই সময় শ্রমিকদের দাবি অগ্রাহ্য করে সরকার সর্বমোট মজুরি নির্ধারণ করে ৫৩০০ টাকা। এর মধ্যে গত তিন বছরে বাজারে লাফিয়ে লাফিয়ে জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি শ্রমিকদের মধ্যে মজুরি বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা অনিবার্যভাবে সামনে এসেছে। বর্তমানে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধির সাথে পানি-বিদ্যুতের দাম দফায় দফায় বাড়া, পাশাপাশি বাসাভাড়া ও গ্যাসের দাম বাড়ানোর প্রস্তাব–এ সবই শ্রমিকদের মধ্যে হাজির হয় একটি চাপ হিসেবে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই কারখানার অন্যান্য দাবির সাথে আশুলিয়ায় যুক্ত হয় মজুরি বৃদ্ধির দাবিও। এতে শ্রমিকদের ওপর কর্তৃপক্ষের রাগ আরো বাড়ে। এবং আন্দোলন দমনের নানা পরিকল্পনা করে সরকার ও মালিকপক্ষ। সরকার ও কর্তৃপক্ষের এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া দেখে মনে হয় শ্রমিকদের বেঁচে থাকার জন্য মজুরির দাবি করা বাড়াবাড়ি। যেহেতু এরা সস্তা মজুর, তাই এই শ্রমিকদের প্রাণ ও স্বপ্ন সবকিছুই সস্তা। ৫৩০০ টাকায় এদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত, এর চেয়ে বেশি চাওয়াটা অন্যায় আবদার। নাগরিক হিসেবে সাংবিধানিক অধিকার অনুযায়ী মত প্রকাশের স্বাধীনতা বলে কিছু এদের থাকতে নেই।

ঢাকা থেকে ৩০-৩৫ কিলোমিটার দূরে আশুলিয়ার শ্রমিকপাড়াগুলোর মধ্যে জামগড়া, ভাদাইল, নরসিংহপুর, নিশ্চিন্তপুর, ছয়তলা, বাইপাইল, ইউনিক, কাইচাবাড়ী, পলী বিদ্যুৎ, গাজীরচটসহ বিভিন্ন এলাকার অলিগলিতে, কারখানার গেটে–সর্বত্রই রয়েছে পুলিশ-ডিবির নিয়মিত আনাগোনা-টহল।

প্রথম দিকে উইন্ডি, দি রোজ, সেতারাসহ কয়েকটি গার্মেন্টের শ্রমিকরা কারখানাভিত্তিক দাবি এবং মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে কারখানার ভেতরেই কাজ বন্ধ করে বসে থাকে। মালিকপক্ষ দুপুরের মধ্যে কারখানা বন্ধ করে দেয়। শ্রমিকদের ভাষ্য মতে, একপর্যায়ে হিন্দি সিনেমার স্টাইলে হোন্ডা আর হকিস্টিকসহ ভাড়াটে মাস্তানরা দি রোজে ঢুকে মালিকপক্ষের হয়ে শ্রমিকদের বেধড়ক মারধর করে। তাদের অপরাধ তারা লিফলেট পড়ছিল, আন্দোলন নিয়ে কথাবার্তা বলছিল। এর পরপরই আন্দোলন ডেকো গ্রুপ, হামীম, শারমিন, স্টার্লিং ক্রিয়েশন, পলমল গ্রুপ, ডিকে গ্রুপ, এনভয়, বান্দু ডিজাইন, পাইওনিয়ার, আইডিয়াসসহ বিভিন্ন কারখানায় ছড়িয়ে পড়ে। একদিকে আন্দোলনের বিস্তার ঘটেছে গত বছরের ১১ থেকে ২১ ডিসেম্বর তারিখ পর্যন্ত এক কারখানা থেকে আরেক কারখানায়, অন্যদিকে এলাকার স্থানীয় ও অন্যান্য শ্রমিক নেতৃত্বের সাথে স্থানীয় এমপি, নৌ ও পরিবহন মন্ত্রী, বিজিএমইএ নেতৃবৃন্দ, পুলিশ, ডিবি, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ বৈঠক করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের নামে আন্দোলন বন্ধ করার উদ্দেশ্যে। উলেখ্য, এইসব মিটিংয়ে সব সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বদলে ডাকা হয় সব সংগঠনের স্থানীয় নেতৃত্ব এবং মালিকদের আস্থাভাজন কিছু কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে। স্থানীয় নেতৃবৃন্দকে বাধ্য করা হয় কারখানার ভেতর এবং গেটের সামনে মালিকপক্ষের সাথে প্রচারণার কাজ করতে, মাইকিং করতে। মাইকে ঘোষণা করা হয় 'অযথা বিশৃঙ্খলা করবেন না, কারো উস্কানিতে পা দেবেন না, আপনারা কাজে যোগ দিন, আপনাদের বাড়িভাড়া আগামী তিন বছরে বাড়বে না' ইত্যাদি ইত্যাদি।

এভাবেই শ্রমিকদের ন্যায্য আন্দোলনকে উস্কানি বলে চিহ্নিত করা হয়। সাথে চলে পুলিশি হামলা, টিয়ারশেল ও রাবার বুলেট ছোড়া। ২০ ডিসেম্বর ২০১৬ পুলিশি হামলায় আহত হয় ১০ জন। ২১ ডিসেম্বর ২০১৬ স্থানীয় নেতৃত্বের বড় অংশকে বৈঠকের দোহাই দিয়ে ডেকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার হন শ্রমিক নেতা সৌমিত্র কুমার দাস, আহমেদ জীবন, রফিকুল ইসলাম সুজন, আল কামরান, শামীম খান, মিজানুর রহমান, মোহাম্মদ ইব্রাহীম, জাহাঙ্গীর ও বিভিন্ন কারখানার শ্রমিকসহ অনেকে। ৪০ জনের ওপরে গ্রেপ্তার করা হয় বলে বিভিন্ন পত্রপত্রিকা থেকে জানা যায়। গ্রেপ্তার থেকে রেহাই মেলেনি একুশে টিভির সাংবাদিক নাজমুল হুদারও। এত কিছুতেও পরিস্থিতি মালিকপক্ষের নিয়ন্ত্রণে না এলে অবশেষে ২১ থেকে ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত মালিকপক্ষ শ্রম আইনের ১৩(১) ধারায় ৫৫টি কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে। সেই সময় উইন্ডিসহ কয়েকটি কারখানার শ্রমিকদের সাথে মালিকদের মৌখিক কিছু আশ্বাসে একটা বোঝাপড়া হলে শ্রমিকরা কোথাও কোথাও কাজ শুরু করে। তার পরও ওইসব কারখানাও বন্ধ কারখানার তালিকায় ফেলে অবৈধ লে অফ ঘোষণা করেন বিজিএম-ইএ নেতৃবৃন্দ। ১৫ পাটুন বিজিবি মোতায়েন করে শ্রমিকদের মধ্যে আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়। ২২ ডিসেম্বর মজুরি বৃদ্ধির যৌক্তিকতা নিয়ে শ্রমিক স্বার্থের পক্ষে ১২ সংগঠনের জোট গার্মেন্ট শ্রমিক অধিকার আন্দোলন আহূত সংবাদ সম্মেলন পুলিশ পণ্ড করে এই জোটের নেতা মোশরেফা মিশুকে আটক করে রাখে সন্ধ্যা পর্যন্ত। কোনো রকম আন্দোলন- সংগ্রাম না করার জন্য তাঁকে নানা রকম হুমকি দেয়া হয়। ওইদিন থেকে চার দিন মোট ৫৯টি কারখানা বন্ধ থাকে। আর কারখানা বন্ধ রাখার সময়টা কাজে লাগিয়ে সরকার ও কারখানা কর্তৃপক্ষ কোন কোন শ্রমিকদের বরখাস্ত করা দরকার তার হিসাব কষে এবং কোন কোন সাধারণ শ্রমিক ও নেতাদের হেনস্তা করতে মামলা প্রয়োজন তার এক লম্বা তালিকা তৈরি করে। এভাবে শুরু হয় আন্দোলন দমনের নতুন নতুন কায়দা। ২৬ ডিসেম্বর কারখানা খোলা হয় ঠিকই, কিন্তু চলতে থাকে শ্রমিক ও শ্রমিক সংগঠকদের হয়রানি, যে হয়রানি এখনও অব্যাহত রয়েছে। আশুলিয়ায় আন্দোলন-সংগ্রামের পথে বাধা-হামলা-নির্যাতন বাড়লে তাদের সাথে সংহতি জানিয়ে ঢাকায় কেন্দ্রীয়ভাবে এবং অন্যান্য শ্রমিকাঞ্চলে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন ও জোট নানা কর্মসূচি পালন করে। ১২ সংগঠনের জোট গার্মেন্ট শ্রমিক অধিকার আন্দোলনসহ বিভিন্ন সংগঠন ও জোট বিক্ষোভ-প্রতিবাদ, সংহতি সমাবেশসহ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ, মানবাধিকার কমিশনের চেয়্যারম্যান বরাবর স্মারকলিপি প্রেরণ, শ্রমমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ, বিজিএমইএর সামনে প্রতিবাদসহ নানা কর্মসূচি সাধ্যমতো চালায়। এসব কর্মসূচিতে শ্রমিকদের ওপর হয়রানি-হামলা-মামলা-নির্যাতন বন্ধের দাবি ছিল প্রধান। একই সাথে মজুরি বৃদ্ধির যৌক্তিকতাও এই কর্মসূচিগুলোতে উঠে আসে।

মজুরি বৃদ্ধির যৌক্তিকতা তক-বিতর্ক

কারখানা খোলার পরও শ্রমিক ও শ্রমিক নেতাদের হয়রানি অব্যাহত

রেখে মিডিয়াসহ সর্বত্র সরকার ও মালিকপক্ষ মজুরির দাবিকে অযৌক্তিক বলে প্রচার করতে থাকে। সরকার ও মালিকপক্ষ বারবার আইনের পূর্ণ ব্যাখ্যা না করে জানায়, শ্রম আইন অনুযায়ী মজুরি বোর্ডের মেয়াদকাল ৫ বছর। এ কথা ঠিকই যে শ্রম আইনে ৫ বছর পর পর মজুরি বোর্ড গঠনের কথা উলেখ আছে। সেই অনুযায়ী ৫ বছর হবে ২০১৮ সালে। কিন্তু আইনে এও উলেখ আছে, প্রয়োজনে ৩ বছরে মজুরি পর্যালোচনা করা যাবে। ১৪০ ধারার (ক) এ স্পষ্ট উলেখ আছে–"সরকারের বিশেষ ক্ষমতা এই আইনের ধারা ১৩৯, ১৪০ ও ১৪২ এ যে বিধানই থাকুক না কেন, বিশেষ পারিপার্শ্বিক অবস্থায় সরকার কোনো শিল্প-সেক্টরের জন্য ঘোষিত নিম্নতম মজুরি কাঠামো বাস্তবায়নের যে কোনো পর্যায়ে নতুনভাবে নিম্নতম মজুরি কাঠামো ঘোষণার জন্য নিম্নতম মজুরি বোর্ড পুনর্গঠন এবং প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা প্রতিপালন সাপেক্ষে পুনরায় নিম্নতম মজুরি হার ঘোষণা করতে পারবে।" এই আইনের আওতায় বর্তমান পরিস্থিতিতে সরকার যে কোনো সময় মজুরি বৃদ্ধির জন্য মজুরি বোর্ড গঠন করতে পারে। মালিকপক্ষ প্রায়ই বলে, ২২৩% মজুরি বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু টাকার অঙ্কে শ্রমিকের মজুরি বাড়লেও বর্তমানে শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি অনেক কমেছে। ১৯৯৪ সালের ১২ বছর পর ২০০৬ সালে প্রথম ৯৩০ টাকার মোট মজুরি বৃদ্ধি হয় ১৬৬২ টাকায়, তা-ও শ্রমিক আন্দোলনের মুখে। পরে ২০০৬-এর পর চার বছরের মাথায় আন্দোলনের মুখে পুনরায় মজুরি ১৬৬২ টাকা থেকে বেড়ে মোট মজুরি হয় ৩০০০ টাকা। এর ঠিক তিন বছরের মাথায় ২০১৩ সালে এটি বেড়ে হয় ৫৩০০ টাকা। গত দুই দফা অর্থাৎ ২০০৬-এর পর ২০১০ ও ২০১৩-তে আন্দোলনের পর মজুরি বৃদ্ধি সরকার পরিস্থিতির বিবেচনায় করেছে। ফলে পাঁচ বছরের আগেই কখনও চার বছরের মাথায়, কখনও তিন বছরের মাথায় সরকারকে মজুরি বোর্ড গঠন করতে হয়েছে। সুতরাং বলার অপেক্ষা রাখে না, বর্তমানে তিন বছর পর বাজারের সাথে সংগতি রাখতেই মজুরি পূর্ণ পর্যালোচনা এবং ন্যূনতম মজুরি বোর্ড গঠন জরুরি হিসেবে সামনে আসাটা অপ্রাসঙ্গিক নয়। বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন, জোট, শ্রমিক অধিকার আন্দোলন ২০১৬-এর মাঝামাঝি সময় থেকেই মজুরি বৃদ্ধির দাবি আনুষ্ঠানিকভাবে বিজিএমইএ, বিকেএমইএ এবং মজুরি বোর্ডে জানায়।

দেশের মোট রপ্তানি আয়ের শতকরা ৮০ ভাগই আসে ৪৪ লাখ তরুণ পোশাক শ্রমিকদের হাত ধরে, যাদের মধ্যে ৮০ ভাগই নারী। ২০১৩ সালে রানা পাজা ধস এবং হাজারো শ্রমিকের প্রাণ হারানোর মতো বড় ঘটনার পরও ২০১৪ সালে রপ্তানি আয় কমেনি। ২০১৪ সালেই মালিকপক্ষ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে বার্ষিক ২৪ বিলিয়ন ডলার আয়ের এই খাতকে ২০২১ সালের মধ্যে ৫০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছানোর। কিন্তু যে তরুণ শ্রমিকদের নিয়ে এই পরিকল্পনা, তাদের জীবনের মান বৃদ্ধি না করে, নিরাপত্তা নিশ্চিত না করে কি সেই লক্ষ্যে পৌঁছা সম্ভব? শ্রমিক ও শিল্পের বিকাশ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শিল্পের উৎপাদনশীলতা টিকিয়ে রাখতে এবং শ্রমশক্তির পুনরুৎপাদনের জন্য প্রয়োজন সরকারের শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করা।

বর্তমানে পোশাক শ্রমিকদের মূল মজুরি ৩০০০ টাকা–সব মিলিয়ে ৫৩০০ টাকা (৩০০০ মূল+১২০০ বাসাভাড়া+চিকিৎসা ২৫০+ যাতায়াত ২০০+খাদ্য ভাতা ৬৫০), যেখানে সাম্প্রতিক সময়ে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, মন্ত্রী-মিনিস্টারদের বেতন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু একই বাজারে অবস্থান করেও শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি পায়নি। বর্তমান মজুরির টাকায় শ্রমিকের বেঁচে থাকা কতটা কঠিন সেটা বলার জন্য বেশি দূর যেতে হয় না। কটা টাকা বেশি পাওয়ার জন্য ওভারটাইম আর নাইট করা তরুণ শ্রমিকের ক্লান্ত জীর্ণ পুষ্টিহীন চেহারাই তার সাক্ষী।

একদিকে বাজারে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, তার ওপর রয়েছে বাসাভাড়া বৃদ্ধির চাপ। ১২০০ টাকায় শ্রমিক অঞ্চলের কোথাও নিম্নমানের একটি ঘর কিংবা বারান্দাঘরও পাওয়া কঠিন। বর্তমানে আশুলিয়ায় একটি পকেট রুম বা বারান্দা রুমের ভাড়া ২০০০ টাকার কম নয়। সাধারণ মাঝারি রুমের ভাড়া ২৫০০ থেকে ৪৫০০ টাকা পর্যন্ত। এইসব ছোট রুমের আয়তন কতটা সেটা যাঁরা শ্রমিকাঞ্চলে গেছেন তাঁরা জানেন। এত ছোট একটা রুমে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে পরিবারের সব সদস্য নিয়ে থাকা কতটা অমানবিক সেটা আর না বলি। স্বামী-স্ত্রী, শ্বশুর-শাশুড়ি, সন্তান, ভাই-বোন একসাথে এক ঘরে থাকতে হয় তাদের। সেখানে মধ্যবিত্তের মতো কোনো 'প্রাইভেসি' চর্চার সুযোগ থাকে না। তার ওপর প্রতিবছরই বাসাভাড়া বৃদ্ধি জীবনকে আরো দুর্বিষহ করে তোলে। এ বছরও মালিকরা বাসাভাড়া বৃদ্ধির ঘোষণা দেয়। পক্ষান্তরে সরকার ও বিজিএমইএ কর্তৃপক্ষ ঘোষণা দেয়, আগামী তিন বছর আশুলিয়ায় বাড়িভাড়া বাড়বে না। কিন্তু তারা পরিষ্কার করে না কী প্রক্রিয়ায় বাড়িভাড়া আশুলিয়াসহ ঢাকা, সাভার, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য শ্রমিকাঞ্চলে নিয়ন্ত্রিত হবে। মজুরি বৃদ্ধি কোনো এলাকাভিত্তিক বিষয় নয় যে এক এলাকায় বাসাভাড়া বাড়া না বাড়ার সাথে এটি নির্ভরশীল। কেবল বাসাভাড়া নয়, বাজারে জিনিসপত্রের দাম, জীবনযাত্রার ব্যয়, পানি-বিদ্যুৎ-গ্যাসের দাম বাড়া সাথে মজুরি বৃদ্ধির দাবি সম্পর্কিত।

নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে তা-ও সরকার জানায়নি। যে কোনো মুহূর্তে আসতে পারে গ্যাসের দাম বাড়ার ঘোষণা। শ্রমিকরা বাজার থেকে যে চাল কেনে (মিনিকেট হাফবয়েল), তার দাম কেজিপ্রতি ৪২ টাকা, ধামরাই চাল ৪২-৪৫ টাকা, ২৯ চাল ৪২ টাকা। ডালের দাম ১০০ থেকে ১৩০ টাকা। আলু ৩০ থেকে ৩৫ টাকা। তেলের দাম ৯০-১২০ টাকা (সূত্র : ২০১৬-র ডিসেম্বরের বাজারদরের হিসাব)। এই বাজারে পরিবারের সদস্যসহ শ্রমিকের ৩০০০ ক্যালরির খাদ্যচাহিদা পূরণ করা কঠিন। শ্রমিকরা কোনো রকম রেশনিংয়ের সুযোগ পায় না। সুযোগ পায় না তাদের সন্তানদের শিক্ষাদানের। এমনকি অর্থাভাবের কারণে বেশির ভাগ শ্রমিক নিজের সন্তানদের নিজের কাছেও রাখতে পারে না। একাত্তরের আগে আদমজী, ইস্পাহানি, লতিফ বাওয়ানীদের কারখানায় শ্রমিকদের থাকার জন্য কলোনি বা ব্যারাক ছিল, স্কুল-হাসপাতাল-খেলার মাঠ ছিল। বর্তমানে পোশাক শ্রমিকরা এসব সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত।

একপর্যায়ে হিন্দি সিনেমার স্টাইলে হোন্ডা আর হকিস্টিকসহ ভাড়াটে মাস্তানরা দি রোজে ঢুকে মালিকপক্ষের হয়ে শ্রমিকদের বেধড়ক মারধর করে। তাদের অপরাধ তারা লিফলেট পড়ছিল, আন্দোলন নিয়ে কথাবার্তা বলছিল। এর পরপরই আন্দোলন ডেকো গ্রুপ, হামীম, শারমিন, স্টার্লিং ক্রিয়েশন, পলমল গ্রুপ, ডিকে গ্রুপ, এনভয়, বান্দু ডিজাইন, পাইওনিয়ার, আইডিয়াসসহ বিভিন্ন কারখানায় ছড়িয়ে পড়ে।

চিকিৎসার খরচও বৃদ্ধি পেয়েছে তিন বছরে কয়েকগুণ। ওষুধপত্র, পরীক্ষা-নিরীক্ষা না হয় বাদই দিলাম, একজন এমবিবিএস ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হলেও ৫০০ টাকা নিচে ফি দেয়া যায় না। সরকারি বা স্বল্পমূল্যে চিকিৎসা বেশির ভাগের হাতের নাগালের বাইরে। যেখানে সর্বনিম্ন দূরত্বে ৫ টাকার নিচে বাসভাড়া নেই, সেখানে ২০০ টাকায় একজনের মাস চলা অসম্ভব। এ অবস্থায় একজন শ্রমিক তার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে দুঃসহভাবে দিন যাপন করছে।

সাধারণ মজুরি নির্ধারণের জন্য পরিবারের খাদ্য খরচ, ক্যালরির হিসাব, বাজারদর, মুদ্রাস্ফীতি, শ্রমিকের কর্মক্ষমতা ও উৎপাদনশীলতা বজায় রাখার শর্তসমূহ আইএলও, জাতিসংঘ এবং আমাদের সংবিধানে বিবেচনার জন্য উলেখ আছে। মজুরি নির্ধারণে কার্যত সরকার সেই বিবেচনা রাখে না। নানা হিসাব থেকে বেশ কিছু শ্রমিক সংগঠন দেখিয়েছে, একজন শ্রমিকের পরিবারের সদস্যসহ মাসে সর্বনিম্ন খরচ হলেও প্রায় ২৮৬২০ টাকা লাগে। তার পরও দেশের পরিস্থিতি, শিল্পের অবস্থা, পে স্কেল বিবেচনা করে তারা সরকার ও মালিকপক্ষের কাছে দাবি করেছে মূল মজুরি ১০০০০ টাকা আর মোট মজুরি ১৬০০০ টাকা (মূল মজুরি ১০০০০+ মধ্যমানের এক রুম ৪০০০+চিকিৎসা ৫৭০+যাতায়াত ৩০দ্ধ২৬=৭৮০+টিফিন ভাতা ৬৫০)। শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির এইসব বিবেচনাকে অযৌক্তিক বলে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়ার সুযোগ কই? সুযোগ কই শ্রমিকদের পেটের দায়ে মাঠে নামা আন্দোলনকে 'ষড়যন্ত্র' বলে অগ্রাহ্য করার?

আন্দোলন দমনের নানা কায়দা : বিলুপ্ত আইনে মামলা

গণতান্ত্রিক উপায়ে শ্রমিকদের দাবি পর্যালোচনা এবং পর্যায়ক্রমে দাবি বিবেচনায় আনার বদলে সমস্তটা অগ্রাহ্য করে সরকার ও মালিকপক্ষ। কারখানাভিত্তিক কোন কোন দাবি গ্রহণ করা যায়, মজুরি বৃদ্ধির দাবির ভিত্তিতে মজুরি বোর্ড গঠন এবং কতটা মজুরি নির্ধারণ করা যায় সেই দিকে না ভেবে মালিকপক্ষ সোজা দমনের পথ বেছে নেয়। দমনের এই পথ দেখে মনে হয় শ্রমিক হওয়ার কারণে এই দেশের নাগরিক হয়েও তারা দাবি উত্থাপনের অধিকার রাখে না। তাই গণতান্ত্রিক পথে না গিয়ে দমন-পীড়নকেই নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পথ হিসেবে বেছে নিয়েছে সরকার ও মালিকপক্ষ। দুনিয়ার কোনো ইতিহাসেই দমন-পীড়ন জনগণ শেষ পর্যন্ত মেনে নেয়নি। যে শ্রমিকরা আমাদের জীবন, সংগ্রাম ও ইতিহাসের সাথে জড়িয়ে আছে, যারা মোট জনগোষ্ঠীর বড় অংশ, যারা রয়েছে আমাদের উন্নতির মূলে–ইতিহাসে আগুয়ান বাহিনী হিসেবে তো তাদেরই থাকার কথা। কিন্তু তাদের যদি কথা বলার সুযোগ না থাকে তাহলে দেশের বাদবাকিদের অবস্থা কী? এই দমন-পীড়ন কি সমাধানের পথ নিয়ে আসতে সক্ষম?

শ্রমিক ও শ্রমিক নেতাদের আন্দোলন থেকে দূরে সরানোর জন্য উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে রাষ্ট্র ও মালিকপক্ষ একের পর এক কয়েকটি করে হয়রানিমূলক মিথ্যা মামলা করেছে। আশুলিয়া থানায় ১০টি মামলা এবং গাজীপুরের জয়দেবপুর উপজেলা থেকে দুটি মামলাসহ মোট ১২টি মামলা করা হয় আশুলিয়ার আন্দোলনের পর। শ্রমিক নেতাদের একেকজনের বিরুদ্ধে ৯টি করে মামলা করা হয়েছে, যাতে কিছুতেই তারা রেহাই না পায়। একটি মামলায় জামিন হলে আরেকটি মামলায় হবে না। এভাবে মামলার দুষ্টচক্রে অনেকদিন জেলহাজতে রাখা যাবে শ্রমিক নেতাদের–এটাই মালিক-সরকারের বুদ্ধি। বিভিন্ন মামলায় শ্রমিক নেতৃবৃন্দকে দফায় দফায় রিমান্ডে নির্যাতন করা হয়। শোনা যায়, রিমান্ডে নানা রকম শারীরিকসহ মানসিক নির্যাতন করা হয়। কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ে। কাউকে খাবার না দিয়ে আবার কারো চোখে কালো কাপড় দিয়ে বেঁধে রাখা হয় দীর্ঘক্ষণ। কাউকে গ্রেপ্তারের সময়, কাউকে রিমান্ডের সময় ক্রসফায়ারের ভয় দেখানো হয়। আশুলিয়ার মামলাগুলোর মধ্যে ৫টি মামলা করা হয় ১৯৭৪-এর বিশেষ ক্ষমতা আইনে, যার মধ্যে আবার ৪টি মামলা ১৯৭৪-এর বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৬/২ এবং ২৫/ডি ধারায় (সূত্র : আশুলিয়া উপজেলা মামলা নং ৩০/৫২৪, ৩১/৫২৪,৩২/৫২৬, ৩৬/৫৩০)। অথচ বিস্ময়ের বিষয় হলো, ১৯৯১ সালের অ্যামেন্ডমেন্টের সেকশন ৩ এর মাধ্যমে (অ্যাক্ট নং ঢঠওওও/১৯৯১) ১৬/২ ধারাটি বিলোপ করা হয়।

আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্র, তার পুলিশ বাহিনী এবং বিচারকরা কি এতটাই অজ্ঞ যে, যে ধারাটি বিলোপ হয়েছে তারও খবর রাখে না! নাকি ইচ্ছাকৃতভাবেই করা হয়েছে এই কাজ? এই ধারায় শ্রমিক নেতাদের বিরুদ্ধে রিমান্ড পর্যন্ত মঞ্জুর হয়েছে। এই বিষয়টি হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করে গার্মেন্ট শ্রমিক ফ্রন্টের নেতা আহমেদ জীবনের বিরুদ্ধে করা মামলা নিয়ে ৩১ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে রিট পিটিশন (রিট পিটিশন নং ৭৩৭/২০১৭) করেন ব্যারিস্টার সারা হোসেন। রিট পিটিশন করা হলে আশুলিয়া থানার ওসি নিঃশর্ত ক্ষমা চান এবং ভুল স্বীকার করেন বিলোপ ধারায় মামলা করার জন্য। ভুল কর্তৃপক্ষ বা পুলিশ করলেও শাস্তি ভোগ করছে শ্রমিক ও শ্রমিক নেতারা। প্রশ্নের মুখোমুখি হননি বিচারকরা, যাঁরা বিলোপ ধারায় শ্রমিকদের কেবল হয়রানির জন্য মামলাগুলোতে জেলে পাঠিয়ে রিমান্ডও কার্যকর করেছেন। ১৯৭৪ সালের এই বিশেষ ক্ষমতা আইনে সাধারণত নিম্ন আদালতে জামিনও হয় না। ফলে কোনো কোনো শ্রমিকের আগাম জামিনের জন্য ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়াকে লড়তে হয় হাইকোর্টে। গার্মেন্ট শ্রমিক আন্দোলনে বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা করার ঘটনাও বিরল দৃষ্টান্ত। হয়রানির উদ্দেশ্যেই যে এই মামলা করা হয়েছে সেটা বুঝতে বেশি বুদ্ধিমান হওয়ার প্রয়োজন হয় না।

> তার পরও ওইসব কারখানাও বন্ধ কারখানার তালিকায় ফেলে অবৈধ লে অফ ঘোষণা করেন বিজিএমইএ নেতৃবৃন্দ। ১৫ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন করে শ্রমিকদের মধ্যে আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়।

মামলাগুলোতে সাধারণ শ্রমিক ও নেতাদের অভিযুক্তকারী হিসেবে 'সন্ত্রাসী', 'চাঁদাবাজ', 'ষড়যন্ত্রকারী', 'অর্থনৈতিক ক্ষতিসাধনকারী', 'চোর'সহ নানা উপাধিতে চিহ্নিত করা হয়। এমনকি শীলতাহানির দায়েও অভিযুক্ত করা হয়। একই সাথে উলেখ করা হয়, লক্ষ থেকে কোটি কোটি (২৫/৫১৯, ৩০/৫২৪) টাকা পর্যন্ত লুটপাটে তারা অংশ নিয়েছে অথবা সহযোগিতা করেছে। ৩০ নং মামলায় ৯ কোটি টাকারও বেশি ক্ষতির পরিমাণ দেখানো হয়েছে। মালিকপক্ষ আরো বলছে, তাদের কাছে প্রমাণসহ ফুটেজ আছে। ফুটেজ আছে শ্রমিক ও শ্রমিক নেতার হামলা, ভাঙচুর, লুটপাট ও উস্কানি প্রদানের । অথচ এখন পর্যন্ত কোনো ফুটেজ বা ছবি মিডিয়ায় প্রকাশিত হয়নি, যেখানে শ্রমিকরা এ রকম তৎপরতা চালায়। শ্রমিকদের সাথে মালিকপক্ষের সাধারণ উত্তেজনাকর তর্কাতর্কির ছবি কোথাও কোথাও তারা বায়ারদেরও পাঠাচ্ছে বলে শোনা যায়। বায়াররা সেগুলোকেই অপতৎপরতা হিসেবে দেখছে। কিন্তু মালিকপক্ষ কিভাবে মাস্তান দিয়ে এবং নানা কায়দায় শ্রমিকদের হয়রানি-নির্যাতন করেছে তা তারা জানে না। লক্ষ কোটি টাকার লুটপাট করতে যে বিরাট নৈরাজ্যিক তৎপরতা

চালাতে হয় তার দৃশ্যও কোথাও কারখানা কর্তৃপক্ষ এখনও দেখাতে সক্ষম হয়নি। শ্রমিক নেতাদের কারো কারো বিরুদ্ধে ৯টি করে মামলা করা হয় বিভিন্ন কারখানার আন্দোলনের রেশ ধরে। এক্ষেত্রে প্রশ্ন আসে, একই সময়ে একই মানুষ কিভাবে কয়েকটি জায়গায় একযোগে অপতৎপরতা চালায়? মামলার তারিখ, অভিযোগের বিষয়, ধারাবিবরণী থেকে বুঝতে বাকি থাকে না, হয়রানি এবং ভীতি ছড়ানোই এই মামলাগুলোর মূল উদ্দেশ্য। একদিকে ফৌজদারি আইনে ১৫০০ জনের বিরুদ্ধে মামলা, অন্যদিকে শ্রম আইনের ২০১৩-র ধারা ২৩ অনুযায়ী অসদাচরণের দায়ে ১৬০০ শ্রমিককে সাময়িক বরখাস্তের নামে ছাঁটাই করে হয়রানি অব্যাহত রাখা হয়। ১৫০০ জনের বিরুদ্ধে মামলা আবার ১৬০০ জন বরখাস্ত হওয়া শ্রমিকদের কারো কারো বাড়ি বাড়ি তলাশি শ্রমিক এলাকায় এখনও ভয়ের পরিবেশ জারি রেখেছে। ১৫০০ শ্রমিকের বিরুদ্ধে করা মামলার মধ্যে অল্পসংখ্যক শ্রমিকের নাম উল্লেখ্য করে বাদবাকি নাম অজ্ঞাতনামায় রাখা আছে। যার ফলে যে কোনো সময় যে কোনো কারখানার বা কারখানার বাইরের যে কাউকে হয়রানির সুযোগ রাখা আছে।

বরখাস্ত করা শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য পাওনা পায়নি। আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী কিংবা পূর্ব থেকে কারখানা কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজনদের অনেককেই আনা হয় ১৬০০ ছাঁটাইকৃতের আওতায়। এদের কেবল সাময়িক বরখাস্ত দেখিয়ে কিছু টাকা দিয়ে বিদায় করা হয়েছে। বরখাস্ত বেনিফিট নেয়ার জন্য বিভিন্ন কারখানার শ্রমিকরা বিজিএমইএতে গেলে মালিক ও সরকারপক্ষের আস্থাভাজন 'শ্রমিক নেতারা' প্রকাশ্যে শ্রমিকদের পাওনা থেকে কখনও ৩০০, কখনও ১০০০ টাকা জোর করে আদায় করে। বিজিএমইএতে আসা বেশির ভাগ শ্রমিক ভয়েই ওই টাকা দিতে বাধ্য হয়। কেউ কেউ এর প্রতিবাদ করে টাকা প্রদানে বিরত থাকে। এদের বিরুদ্ধে কোনো রকম আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে মালিক বা সরকারপক্ষকে দেখা যায় না। অথচ দেখা যায় সাধারণ শ্রমিকদের 'চাঁদাবাজ', 'সন্ত্রাসী' হিসেবে চিহ্নিত করে মামলা করতে। একে তো বরখাস্ত হওয়া শ্রমিকরা একেকজন বছরের পর বছর একেক কারখানায় কাজ করে নিজেদের পাওনা ঠিকমতো আদায় করতে পারেনি, তার ওপর বিজিএমইএ ভবনের ভেতর দাঁড়িয়ে শ্রমিক স্বার্থের বিরোধীরা এই কাজ করার সাহস পায়। কারণ তাদের মাথার ওপর ছায়া হিসেবে আছে সরকার ও মালিকপক্ষ স্বয়ং। এই পুরো পরিস্থিতিতে শ্রমিকদের পক্ষে প্রকৃত সৎ নেতৃত্ব কারা এবং মালিকদের আস্থাভাজন কারা এটি শ্রমিকদের সামনে অল্পবিস্তর হাজির হয়েছে।

> একদিকে বাজারে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, তার ওপর রয়েছে বাসাভাড়া বৃদ্ধির চাপ। ১২০০ টাকায় শ্রমিক অঞ্চলের কোথাও নিম্নমানের একটি ঘর কিংবা বারান্দাঘরও পাওয়া কঠিন। বর্তমানে আশুলিয়ায় একটি পকেট রুম বা বারান্দা রুমের ভাড়া ২০০০ টাকার কম নয়। সাধারণ মাঝারি রুমের ভাড়া ২৫০০ থেকে ৪৫০০ টাকা পর্যন্ত।

১৬০০ শ্রমিককে সাময়িক বরখাস্ত এবং পরে চাকরিচ্যুত করার ক্ষেত্রে মালিকরা লোক দেখানো ত্রিপক্ষীয় বৈঠক করে তাদের নিজেদের পছন্দনীয় তথাকথিত 'ইউনিয়নের' নেতৃত্বকে সাথে নিয়ে। যারা সত্যিকারার্থে শ্রমিক স্বার্থে কাজ করে তাদের অনেকে বিভিন্ন কারখানার বিষয়ে সুরাহা করার জন্য লিখিতভাবে এবং সাক্ষাৎ করে বিজিএমইএতে জানালেও আস্থাভাজনদের সাথে বৈঠক করেই ত্রিপক্ষীয় চুক্তি হয়। এই আস্থাভাজনরা মালিকদের স্বার্থই রক্ষা করে, যেখানে শ্রমিকরা তাদের যথাযথ পাওনা থেকেও হয় বঞ্চিত। একই সাথে এই শ্রমিকরা যাতে আশপাশে কাজ না পায়, তার জন্য আশুলিয়ার প্রতিটি কারখানায় তাদের তালিকা ছবিসহ প্রেরণ করে কর্তৃপক্ষ। মনে হয় বরখাস্ত হওয়া শ্রমিকরা যেন একেকজন 'সন্ত্রাসী', তাদের কিছুতেই কাজে নেয়া যাবে না। ফলে অন্য কারখানায় কাজের খোঁজে গেলেও তাদের কারখানা গেট থেকে কিংবা ইন্টারভিউয়ের সময় ওই তালিকার সাথে নাম-ছবি মিলিয়ে কাজ দেয়া বন্ধ রাখা হয়। এতে শ্রমিকদের জন্য একটা বিপর্যস্ত অবস্থা তৈরি হয়েছে। বহুদিন থেকে যে এলাকায় শ্রমিকরা থেকেছে সেই এলাকা থেকে চলে যেতে হচ্ছে অন্যত্র কাজের খোঁজে।

আন্দোলনের ধরন ও প্রকৃতি

২০১৬-র ডিসেম্বরের শেষ ভাগে চলা আশুলিয়ার আন্দোলনটিতে প্রাথমিকভাবে কারখানাভিত্তিক দাবি-দাওয়া এবং স্বতঃস্ফূর্ততাই প্রধান ছিল। সংগঠিত শক্তি হিসেবে শ্রমিক স্বার্থের পক্ষের কিছু সংগঠন ও জোট কারখানাভিত্তিক দাবি ও মজুরি নিয়ে কাজ করলেও সেটি আলাদা আলাদা এবং বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্তভাবে করা হয়। আন্দোলনের স্থায়িত্ব ও প্রচারণার কাজ ছিল ক্ষণস্থায়ী। এটি দেশব্যাপী পোশাক শ্রমিকদের কোনো এক বা একাধিক দাবির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলন না হওয়ায় শ্রমিকদের মামলা-মোকদ্দমা, পুলিশি হয়রানি, নির্যাতন করে কোণঠাসা করতে সক্ষম হয়েছে সরকার ও মালিকপক্ষ। প্রাথমিকভাবে আন্দোলন কারখনাভিত্তিক দাবি-দাওয়ায় সীমাবদ্ধ থাকলেও পরে মজুরি বৃদ্ধির দাবির প্রসঙ্গটিই প্রধান বিষয়ে পরিণত হয়। মালিকরা এই দাবির বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হয়ে পড়ে। কিন্তু মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলন আশুলিয়ার বাইরে অন্য শ্রমিকাঞ্চলে বিস্তার ঘটেনি এবং অন্য শ্রমিকাঞ্চলের শ্রমিকরাও একযোগে আন্দোলন সংগঠিত করেনি। মজুরির দাবি সব পোশাক শ্রমিকের দাবি হলেও আশুলিয়ার আন্দোলনের রূপ-বৈশিষ্ট্যই বলে দেয় কী কী কারণে শেষ পর্যন্ত এটি এলাকাভিত্তিক আন্দোলনে পরিণত হয় এবং স্বতঃস্ফূর্ততাই প্রধান চালিকাশক্তিতে পরিণত হয়। এই দুর্বলতার সুযোগেই সরকার ও মালিকপক্ষ এককাতারে দাঁড়িয়ে চড়াও হয় শ্রমিক ও শ্রমিক নেতৃত্বের ওপর। গণতন্ত্র, সাংবিধানিক অধিকার, মত প্রকাশের স্বাধীনতা–সবই শ্রমিকদের বেলায় এসে এখানে যেন মুখ থুবড়ে পড়ে।

কারখানার ভেতরে শ্রমিকরা আইন মেনে কর্মবিরতি করেনি এবং শ্রমিকদের মধ্যে ইউনিয়নের শিক্ষা নেই বলেও মালিকপক্ষ নানা যুক্তি দাঁড় করিয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে তো কেবল কোনো সংগঠনের সদস্য হওয়ার অপরাধেই সঙ্গে সঙ্গে বিপদে পড়তে কিংবা ছাঁটাই হতে হয়। বেশির ভাগ কারখানায় যেখানে প্রকৃত ইউনিয়ন নেই বা কোনো প্রকৃত শ্রমিক সংগঠনের কাজ করার সুযোগ নেই, সেখানে শ্রমিকরা সুশিক্ষিত হওয়ার সুযোগ পাবে কীভাবে? মালিকপক্ষের আস্থাভাজান 'ইউনিয়ন বা পার্টিসিপেটরি' কমিটির নেতারাও মালিকের পক্ষ হয়েও শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না, এটাই স্বাভাবিক। শোনা যায়, এবার আশুলিয়ায় গ্রেপ্তারকৃত নেতৃত্বের একটা অংশ মালিকদের আস্থাভাজন কিংবা বিদেশি শক্তি ও বিভিন্ন সংস্থার মদদপুষ্ট এবং কয়েকজন বিরোধী দলের শ্রমিক সংগঠন। তাহলে তারা গ্রেপ্তার হলো কেন? এটা কি সাধারণের চোখে ধুলা দেয়া? কিংবা ঘোলা পানিতে মাছ শিকার? বা মালিক ও ক্ষমতাসীনদের কথা শোনারাও শ্রমিকদের বেহাল দশা দেখে মালিকদের বিরোধী হয়ে গেছে, বেয়াড়া

হয়ে উঠেছে? এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে।

আশুলিয়া আন্দোলনে মালিকদের আস্থাভাজনদের বাইরে যাঁরা প্রকৃত অর্থে শ্রমিকদের পক্ষে কাজ করেন তাঁরা এই আন্দোলনে সামান্য কিছু প্রভাব ফেলতে পেরেছেন ঠিকই। কিন্তু বর্তমান দেশীয় পরিস্থিতিতে প্রকৃত ইউনিয়ন এবং শ্রমিক আন্দোলনের অভাবে তাঁরাও পদে পদে নানা বাধার সম্মুখীন হয়েছেন এবং আন্দোলনকে নির্দিষ্ট গতিপথে যথাযথভাবে অগ্রসর করতে পারেননি। এই দফায় আশুলিয়ার শ্রমিকরা নিয়ম মেনে ধর্মঘট করেনি এটি যেমন সত্য, তেমনি এও সত্য যে নিয়ম মেনে ধর্মঘট করা বর্তমান সময়ে কোনো শ্রমিকের পক্ষে সম্ভব নয়। সরকার ও মালিকপক্ষই প্রকৃত ইউনিয়ন করার মতো কোনো অবস্থা বাস্তবে জারি রাখেনি। সংগঠন-সংগ্রাম-প্রকৃত ইউনিয়ন করার সুযোগ না রেখে সরকার ও মালিকপক্ষের ট্রেড ইউনিয়নের শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রমিক শ্রেণির আকাঙ্ক্ষা করা অনেকটা পাখির পাখা কেটে তার উড়াল দেখতে চাওয়ার শখের মতো বিষয়।

শ্রমিকদের ন্যায্য দাবিকে উপেক্ষা করে সরকার-মালিক একদিকে দমনের পথ বেছে নিয়েছে, অন্যদিকে ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলন এবং সৎ নিষ্ঠাবান শ্রমিক নেতৃত্বের অভাবে এখনও যথাযথ শ্রমিক আন্দোলন দেশব্যাপী দানা বাঁধতে পারেনি। সারা দেশে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে জনগণের মধ্যে এক ধরনের ভীতির সংস্কৃতি বিরাজ করছে। যে কোনো বিরোধী স্বর বা ভিন্নমত ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে, তাই ঝুঁকি থেকে দূরে থাকাই যেন পথ। এসবের বাইরে নয় শ্রমিকাঞ্চলও।

আশুলিয়ার পরিস্থিতিতে এবার শ্রমিক অধিকার আন্দোলন নামে ১২ সংগঠনের জোটসহ শ্রমিক স্বার্থের পক্ষের বেশ কয়েকটি সংগঠন মাঠে থাকলেও রাজনৈতিক দলগুলোকে গুরুত্বের সাথে এ বিষয়ে কথা বলতে দেখা যায়নি। বাম ধারা ও প্রগতিশীল দলগুলো কিছু প্রতিবাদ জানালেও তাদের প্রচার মিডিয়ায় তেমন গুরুত্ব পায়নি। নাগরিক জীবনের নানা সমস্যা, পরিবেশ প্রশ্ন, নারী প্রশ্ন, মৌলবাদ বিরধিতা, ব্লগার খুনের বিরোধিতাসহ নানা ইস্যুতে সুশীল সমাজের কিছু প্রতিবাদ কখনও কখনও শাহবাগে শহীদ মিনারে দেখা যায়। দেখা যায় কিছু লেখালেখিতেও। অন্তত ফেসবুকে ঝড় তো দেখা যায়। কিন্তু এবার দু-একজন বাদে চুপ ছিল বেশির ভাগ বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, লেখক, শিল্পী এবং জাতির বিবেক হিসেবে পরিচিতরা। তেমন কেউ শ্রমিকদের পক্ষে দুপাতা লেখেওনি। এর কারণ কী? এটা শ্রমিকের বিষয় বলে?

১৯৭১ সালে জাতির মেরুদণ্ড ভাঙার জন্য বুদ্ধিজীবী-লেখকদের হত্যা করা হয়েছিল। আর আজকের সময়ে বুদ্ধিজীবী হিসেবে পরিচিতদের বড় অংশ গা বাঁচিয়ে চলে কিংবা ক্ষমতার ছায়াতলে থেকে ক্ষমতাসীনদের পক্ষেই মত সৃষ্টির কাজ করে। এ জন্য বোধ হয় সরকার ও মালিকপক্ষও বুঝতে পেরে আসল আগুয়ান বাহিনী শ্রমিক আর শ্রমিক নেতাদের গ্রেপ্তার করেছে এবং তাদের তাড়া করে বেড়াচ্ছে। স্থানীয় নেতাদের সাথে সাথে শ্রমিক সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতাদের নানাভাবে তাড়ার মধ্যে রাখা হয়েছে। মাঠে নামলেই বিপদ হবে–এই সতর্কবাণী নানাভাবে শ্রমিক নেতাদের কানে পৌঁছানো হয়েছে। শ্রমিক সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকেও এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হয়েছে পুরো সময়ে।

পাশাপাশি সরকার ও মালিকপক্ষ উপলব্ধি করতে পেরেছে, স্থানীয় শ্রমিক ও নেতারা সংগঠনের শক্তি। এরা মধ্যবিত্ত সুযোগ-সুবিধার বাইরে এবং ভীষণ দুরবস্থার মধ্যে থেকেও নিজেদের সুবিধার কথা চিন্তা না করে এই দুঃসময়েও আন্দোলনে অংশ নিয়েছে। তাই এবার তাদের কোমর ভাঙার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সিদ্ধান্ত নিয়েছে একই সাথে তাদের মনোবল ভাঙার। এ কারণেই মামলা-হামলা-হয়রানির চাপ এসেছে বিশেষভাবে স্থানীয় নেতাদের একেকজনের ওপর। কেউ জেলে থেকে, কেউ জেলের বাইরে ঘরছাড়া অবস্থায় থেকেই হয়রানি মোকাবেলা করছে। কিন্তু একজনকে আক্রমণ করলে তার জায়গায় আরেকজন স্থলাভিষিক্ত হবে, আন্দোলনে-সংগ্রামে ভূমিকা রাখবে, টাকা-পয়সা কিংবা কোনো সুবিধা, ক্ষমতা কিংবা বল প্রয়োগে সবার মনোবল ভাঙা কঠিন–এসব ভাবনা হয়তো সরকার ও মালিকপক্ষের সবার মাথায় আসেনি। যদিও একজনের জায়গায় আরেকজন আদর্শিক নেতৃত্ব শ্রমিক আন্দোলনে অতি দ্রুত স্থলাভিষিক্ত হওয়ার মতো অবস্থা এখনো তৈরি হয়নি। তেমনি সৎ যোগ্য নেতৃত্বরা এখনো পুরোপুরি প্রস্তুত বলা যাবে না। তার পরও এটা বলা যায়, মালিক-সরকারের পোষ্য নামধারী 'শ্রমিক নেতারা' শ্রমিকদের পক্ষে না দাঁড়ালেও ভবিষ্যতে শ্রেণির স্বার্থেই শ্রমিকরা দাঁড়াবে। এরাই ভরসা। বিশেষ পরিস্থিতিতে এখন শান্ত থাকলেও পেটের দায়ে, আত্মসম্মানের দায়েই শ্রমিকরা কথা বলবে, আন্দোলন করবে। পোশাক শ্রমিকরা এদেশের নাগরিক। নাগরিক অধিকার নিয়ে মাথা উঁচু করে বাঁচার জন্যই মজুরি বৃদ্ধি জরুরি। আত্মমর্যাদার সেই আন্দোলন সরকার-মালিকের ইচ্ছায় দমনের পথে কতটা বন্ধ করা যাবে বলা মুশকিল।

দেশ ও দশের এবং শিল্প ও উৎপাদন বিকাশের স্বার্থেই সরকার ও মালিকেরও এ বিষয়ে মনোযোগী হওয়া দরকার। দরকার বিদেশি ক্রেতাদের সাথে দর-কষাকষির ক্ষমতা বৃদ্ধি করা, যাতে বিদেশি ক্রেতারা প্রতিটি টি-শার্ট তৈরির মূল্য বেশি দেয়। বিদেশি ক্রেতারা সস্তা মজুরের খোঁজে আমাদের দেশে আসে ঠিকই, কিন্তু প্রতিটি পণ্যে একটু বেশি মূল্য দেয়ার কথা ভাবতে পারে না। তাই বায়ারদের সাথে মালিকপক্ষের দর-কষাকষিও জরুরি শিল্প বিকাশের জন্য। দেশি ও বিদেশি মালিকরা নিজেদের লাভের অঙ্ক থেকে খুব সামান্য ভাগ শ্রমিকদের দিলেই এই শিল্প আরো বিকশিত হবে। এসবের পাশাপাশি সবচেয়ে বেশি জরুরি শ্রমিক স্বার্থের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন। বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত বা অসংগঠিত নয়, বরং সংগঠিত ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলন শক্তিশালী হলেই সরকার ও মালিকপক্ষ বাধ্য হবে মজুরির দাবিকে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বিবেচনায় আনতে।

তাসলিমা আখতার: সংগঠক, আলোকচিত্রশিল্পী। সভাপ্রধান, বাংলাদেশ গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতি।
ইমেইল: taslima_74@yahoo.com